ছাদ
আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

উচ্চতাভীতিকে আমার সবসময়েই রূপকী মনে হতো।

'চাঁদের বুড়ি কেন চাঁদ থেকে পড়ে যায়না ?' - আমার আশেপাশে যারা বড় হচ্ছিলো এ প্রশ্ন তারা মাঝে মাঝে করলেও আমি কোনোদিন করিনি। ট্র্যাপিজের উড়ন্ত হার্লেকিনদের নীচে যে জাল পাতা তার সাথে আদৌ ওদের কোনো সম্পর্ক আছে - এ কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি। বড় হ'তে হ'তে লোকের মুখে উচ্চতাভীতির কথা শুনতে পেতাম। ওতে ভোগা মানুষদের দেখতাম। দুটো জিনিস লক্ষ্য করেছি। এরা প্রত্যেকেই রঙিন ফানুস পছন্দ করেন। অনেকের বেডরুমে রঙচঙে হট-এয়ার-বেলুনের ছবি। ঠিক স্বামী-স্ত্রীর দুটো বালিশের মাঝের ফাঁকা জায়গাটার ওপরে। আর হলো এরা কেউ প্যারাশুটের ব্যবহার জানেন না। মানে প্যারাশুট নিয়ে এদের কাউকে কোনোদিন কৌতূহলী হতেও দেখিনি। তার মধ্যে বাবলুকাকুর কথা বিশেষ ক'রে মনে আছে। বাবলুকাকু ছিলো বিমানকর্মী। এমন কর্মী যাকে কখনো বিমানে চড়তে হয়না। কিন্তু সেই শেষে একদিন চড়তে হলো কি একটা কাজে। আর চড়বি তো চড় সেই বিমানটাই ব্রহ্মপুত্র নদী পেরোবার সময় বিপন্ন হলো। ফোর্স্‌ড ল্যান্ডিং করানো যাচ্ছেনা ফলে ঠিক হলো প্লেন নীচু হবে আর যাত্রীরা প্যারাশুট নিয়ে নামবে। নদীর ঐ অঞ্চলে তিনটে ফেরীবোট ছিলো একটা লঞ্চস্টীমারও। কোনো অসুবিধে ছিলোনা। ১২ জন যাত্রীকে সেবিকা প্যারাশুট পরিয়ে লাফানোর কায়দা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন - 'নাথিং টু ওরি জাম্প ফ্রিলি কাউন্ট টেন অ্যান্ড দেন পুল দ্য স্ট্র্যাপ।' বাবলুকাকু এমনিতেই তোতলা। এই অবস্থায় ওর তোতলামি বেড়ে গেলো চারগুণ। যখন ওর লাফাবার সুযোগ এলো সেবিকাকে কি একটা জিজ্ঞেস করতে গেলো 'ম্যাম্যাম্যাম্যা.....য়্যায়্যায়ায়া....ডাম.....শুউউউড আই.....। মহিলা চটপট বললেন - 'য়্যু ডোন্ট কাউন্ট টেন। য়্যু কাউন্ট আপটু থ্রি ওনলি।'

চোদ্দ বছর বয়সে একটা সুতো। শিহরণের। চামড়ার নীচে রক্তঢোঁড়া হয়। বাবার বইতাক থেকে একটা বই পেড়ে তার মলাটের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। সেটাই ছিলো উচ্চতাভীতির প্রথম শিহরণ। আর বইটা ছিলো আলবের কামুর 'দ্য ফল'। পেঙ্গুইন সিরিজের বই। সাদা ধবধবে মলাট। একটা কালো স্যুট পরা সাহেব তার মধ্যে মাথা-নীচে-পা-ওপরে পড়ে যাচ্ছিলো। আমি বইটা পড়ার চেষ্টা করি এবং এক মাসের মধ্যে বুঝতে পারি উচ্চতাভীতি আসলে এক ভারি আঁতেল ব্যাপার। যেমন নাগরিক তেমনি দার্শনিক। তার সঙ্গে এটাও মনে হলো যে আসলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতদখলের আগে এদেশে উচ্চতাভীতি ছিলোনা। ওটা কলোনিস্টরা আমাদের দেয়। যেমন মার্কিন মুলুকে এই একই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সেখানকার 'রাঙা ভারতীয়'দের দিয়েছিলো ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা যাতে তাদের বংশ এক ধাক্কায় স্কোয়েয়ার রুট হয়ে যায়।

একটা ছাদ ছিলো আমাদের। সরি দুটো। একটা পাঁচতলার। আর একটা সাড়ে পাঁচতলার। এই ছাদে যাতায়াত ছিলো যৌথ পরিবারের সব তুতো ভাইবোনের। এমনকি সংসারে যারা আশ্রিত তাদেরো কারো কারো। আর তখন আমাদের বয়স আরো কম ছিলো। আমার ৮-৯। আর তখন আমার ডাকনাম ছিলো সোনা। কলকাতার যে সামান্য কয়েকশো বাড়ির ছাদ থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়োটা স্পষ্ট দেখা যেত আমাদের বাড়ি ছিলো সেইরকম ছাদে গর্বিতা। ফিমেল-অ্যাডজেক্টিভ করলাম কেননা আমাদের বাড়ির নাম ছিলো 'শঙ্কটা ধাম'। 'শঙ্কটা' বোধকরি আমার দাদুর ঠাকুমার নাম ছিলো। আর সেই বাড়ির ছাদকে কেন্দ্র করেই নানা প্রকারের ভীতি আমাদের বালক-বালিকা মনে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

সবচেয়ে আগে আসবে ছোটোবুড়ির কথা। তবে ছোটোবুড়িকে টানার আগে এটা বলি যে ক্লাস সিক্স-য়ে একদিন পাঁচতলার ছাদে একা শুয়ে শুয়ে আমি এমনভাবে আকাশ দেখি প্রথমবার যা এর আগে বা পরে কোনোদিন দেখিনি। আর সেই আকাশ

আমাকে এনে দিয়েছিলো শীতকাল
শীতকালের সাথে একমাত্র সম্পর্ক ছিলো কোনো লেফাফার
কেননা লেফাফার সাথে একমাত্র সম্পর্ক ছিলো সেই
নীল লেফের
(আমি তখনো ঠিক 'প' বলতে পারতাম না মাঝেসাঝে)
জ্ঞানের আলোক যেখানে জ্বালানো যায়না
সেই লেখার ওপর উষ্ণ আয়তন এক
রপ্ত শব্দের অভাবনীয় এপিসোডের
এ পর্যন্ত অব্যক্ত অভিব্যক্তির
গাঢ় সামুদ্রিক গোপনীয়তা এক নীলাভ লেপের আকারে
টেনে ঢেকে দেওয়া যায় জঞ্জাল

এইরকমই আমি ভাবতাম যে আছে আছে

ওই মেঘের ওপরে আসল আকাশ যা আমি ঠিক
দেখতে পাচ্ছিনা
কে যেন বলেছিলো মুর্গি ছাড়ানো দেখতে
ঐ রক্ত পালক পার করা হাড় দেখতে
তেলরঙের ছবির মিলিমিটার কাছে গিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে গন্ধ নিতে
কেমন রঙ কি দিয়ে তৈরি কিভাবে
আসলে সেটাই আকাশ বিমূর্তের মূর্ত
আর সেই সময়েই আমি ঠিক করি আমার ছেলের নাম
হবে নীলাভ
যা সত্যি হয়ে যায় ঠিক একুশ বছর পর

যদিও ছোটোবুড়ি সেই তখনি আমার হাত দেখে একদিন বলেছিলো যে আমার নাকি একটি মাত্র ছেলে হবে একুশ বছর পর তার মন ও মননের রঙ হবে নীলবর্ণ আর তার মায়ের সাথে ওয়াইনের কি একটা সম্পর্ক থাকবে। তবে আগে বলি কে ছোটোবুড়ি। ওয়েল ! আমি সেটা আজো ঠিক জানিনা। কিন্তু তিনি সত্যিই ছিলেন এক ছোটোখাটো আকারের বুড়ি। কি তার নাম ছিলো মনে নেই কিন্তু বাড়ির সকলে তাকে 'ছোটোবুড়ি' বলতো। তার সব চুল সাদা ছিলো এবং সে ছিলো প্রচন্ড চটপটে ও ছটফটে। যেন পারলেই ছোটে। হয়তো সেই কারণেও সে 'ছোটো বুড়ি'। কিন্তু আমাদের বাড়িতে সে ঠিক থাকতো না। কাছেই কোথাও। তার বে-থা হয়নি। সে খুব সম্ভব আমার দাদুর দূর সম্পর্কের কারো মেয়ে ছিলো। দাদু তার টাকা-পয়সা-সম্পত্তি-করপোরশেন ট্যাক্স এইসব করে দিতো। ইত্যাদি।

ছোটোবুড়ি যখন আসতেন আমাদের বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকতেন। যৌথ পরিবার বলেই কখনো আমাদের সাথে কখনো সেজ কাকার ফ্ল্যাটে কখনোবা মেজজ্যেঠুদের ডেরায়। এক একবার এক এক জায়গায়। ছোটোবুড়ি কেবল সবজিপাতি খেতেন কিন্তু বেজায় পেটুক ছিলেন ; বিশেষ ক'রে বেগুন নিয়ে কিছু হলেই মা-কাকী-জ্যেঠিমাদের রান্নাঘরে আমাদের চুরি করতে পাঠাতেন এবং রিয়া অর্থাৎ আমার সমবয়সী মেজজ্যেঠুর মেয়ে একদিন এসে আমাদের বললো - জানিস ছোটোবুড়ি মোটেই ফরসা নয় ওর 'শ্বেতী' আছে।

আমি ইতিমধ্যেই শুনেছিলাম সাদা বাঘকে অ্যালবিনো বলে আর আমার ধারণা হয়েছিলো ঈশ্বর যাদের ওপর খুশি হন তাদেরই 'শ্বেতী' হয়। এটা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোনো কোনো জন্তুর ওপরও ঈশ্বর খুশী হন। যেমন ধরুন ভাল্লুক হাতী। আর হোয়াইট এলিফ্যান্টের গোটা কনসেপ্টটাই আমার কাছে এইরকম ছিলো। সুস্পষ্ট। ধোঁয়াশাহীন। হাতী উইথ শ্বেতী। এইসব কারণেই ছোটোবুড়িকে আমি বিশেষ সমীহ করতাম। ছোটোবুড়ি ঘুষ হিসেবে সকলকেই মুড়কি দিতেন। সেইটা ওঁর সাদা উলের ব্যাগে লুকোনো থাকতো (বলতে পাছে ভুলে যাই এইবেলা বলি ছোটোবুড়ি একটা গোলকীপারদের মতো সাদা ব্লাউজ পড়তেন। ফুলহাতা।) । বুড়ি বলতো 'আমার কাছে তোরা সবাই মুড়কি। কেউ মুড়ি নোস।' এর মানে আমি বুঝতাম না। আজো বুঝি না।

এপাশে ঘর জানলা খুলে দিলে আবার ঘর
তেলরঙ দিয়ে তাই বন্ধ জানলা ভূমিকা পাল্টানো তার
বাহির কবে যেন কিভাবে ভিতর ফলে জানলা খুলে নিজেদেরই দেখায়
জানলা খুলে দিলে যাতায়াতের বাধা
এমনি তার মিথ্যে পার্সপেকটিভ

আমাদের নিগূঢ়তা খুঁজে পাওয়া গেলো আবার
পুড়ে খাক হ'য়ে যাওয়া অবতারের ছাই ঘেঁটে
আমাদের দিনদৈনিক
তেমন গুনগুন
গানপাত্রের কাঁচকে তার স্বচ্ছতা সম্বন্ধে
এক প্রবল আত্মবিশ্বাস এনে দেয়
উইলো গাছে বাদাম ফলে না
সে তার গন্ধ বললো
বুলেভারের শেষে এক কোয়া অতীতের দিকে চোখ রেখে
হাঁটছি
আর রাগী মেয়েটা
পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তিনতলা থেকে

সার্বিক সংবদ্ধতার অনচ্ছ অ্যানাটমি নিয়ে
কারো কোনো কৌতূহল নেই

একদিন ঝাড়লন্ঠন হঠাৎ ভেঙে প'ড়ে গেলো
কাঠের ওপর বাজলো কাঁচ আলোকলতার প্রতিফলন পদ্ধতি
বিচূর্ণ

এগিয়ে আসছে কিশোরীদের বড়ো মুখগুলো
দূরে তাদের কাঁধ-কোমর-পা
দূরে তাদের ফুলছাপ স্কার্ট

ছোটোবুড়িকে সমীহ করার আরো একটা বড় কারণ ছিলো। বুড়ি টেরিফিক ঘুড়ি ওড়াতো। মাইরি ! আপনারা জানেন আমি ছন্দ ভালোবাসিনা। সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলছি না। প্রমাণস্বরূপ আমাদের পাঁচতলার ছাদের একটা ছবি দিলাম নীচে। আমরা বাড়ি ছেড়ে দেবার চূড়ান্ত দিনটার আগের দিন দুপুরে এই ছবি তুলে দিয়েছিলো আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্র ২২ ঃ যেখানে ভাঙা অ্যান্টেনা ঠিক ওই কোণ থেকে ঘুড়িটা ছোটোবুড়ি উদ্ধার করে।
তখন অ্যান্টেনা ছিলোনা অবশ্য। কেননা তখনো কলকাতায় 'দূরদর্শন' শব্দটার জন্ম হয়নি।

তা ছোটোবুড়ি ঘুড়ি ওড়াতো। সাঙ্ঘাতিক ! সেটা আমাদের জানারো কথা নয়। আমাদের কারোই তখনো ঘুড়ি ওড়াবার বয়স হয়নি। এটা ছিলো বিশ শতকের সত্তর দশকের গোড়ার দিক। ছাদে সেদিন বিকেলে ছোটোবুড়ি আমাকে আর নন্দিনীকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলো। নন্দিনী কে এই সুযোগে বলে রাখি কেননা তার কথা বারে বার আসবে। যেহেতু তার সাথে আমার প্রথম দেখা ছাদে

যদিও সে আমাদেরি বাড়ির বাসীন্দা ছিলো
যেমন বাস্তুসাপও থাকে
আমরা জানতে পারিনা
চ'লে যাবার আগের দিন পর্যন্ত
শূন্যতার যে ধারণা খাঁটি ভারতীয় বৈদিকও বলা যায়
তার বুক চিরে জীবন্ত চলমান প্যারাবোলার রূপ
দেখিয়ে সে তার যাবতীয় পবিত্র অপর্যাপ্ত
দৈব নগ্নতা নিয়ে
দেবদূতের বাহনের রূপ ধ'রে
বেরিয়ে আসে যেভাবে মনে করো
মাংসের পেঁয়াজের ভেতর থেকে তার তেল ওঠে
আমরা বুঝতে পারি এখন ঝোল রসস্থ
জীবনের সর্বোচ্চ ঘনতা যে তার রসদের মধ্যেই সন্নিবদ্ধ
এক একটা আচমকা হাওয়া বুকের মধ্যে থেকে খাঁচাটাকেই
মোচড়ে বের ক'রে নেয়
বাইরে ঘোরে ছিয়ানব্বই ফারেনহাইটের একলা দুপুর
আর ঠুকরোতে আসা ছাতার কোনো ফল পায়না

এই খরায় সুপুরি ভিন্ন

সে আমার চেয়ে এক-দেড় বছরের বড় ছিলো। ফলে ওর বোধহয় তখন সাড়ে দশ। একটা ঘুড়ি কোথা থেকে বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন আমাদের ছাদের জলের ট্যাঙ্কের ওপর যে বাঁশের মাচা তার বাঁশে এসে আটকে যায়। আমি ট্যাংকের বাঁশে আটকানো সুতো দাঁত দিয়ে কাটতে যাই। মাঞ্জা ছিলো মাঞ্জা কাকে বলে জানতাম না। ঠোঁট কেটে প্রায় গন্নাকাটা হবার জোগাড়। গলগল করে রক্ত ঝরতে ঝরতে সাদা টেরিকটনের শার্টে আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনামের রক্তাক্ত মানচিত্র তৈরি। কিন্তু ঘুড়ির সুতো কেটে দিতে পেরেছিলাম। নন্দিনী যখন আমার রক্ত দেখে কাঁদছে আর আমি হাসছি ছোটোবুড়ি ঘুড়ির সুতো ছিঁড়ে নিয়ে ঘুড়িটা নিজের কর্তৃত্বে এনে ওড়াতে থাকে। আমি ভুলে যাই রক্তপড়া আর নন্দিনীর চোখের জলও চকিতে শুকোয়। উল্টোদিকের ফুটপাথের পেছনের সারিতে যাদের বাড়ি যাদের বাড়ি থেকে ঘুড়িটা ভেসে এসেছিলো তারা বুঝতে পারে যে আমরা তাদের ঘুড়ির দখলে। তারা আওয়াজ তোলে। কয়েক মিনিট পর একটা জাপানী পতাকা ঘুড়ি ছাড়ে। চাঁদিয়াল। আমাদের তাক করে। আমাদের ঝাঁপা ঘুড়িটাও চাঁদিয়াল। নীলচে-সবুজ। ল্যাজে লাল। সুতো টানটান। মাঞ্জায় ছোটোবুড়ির আঙুলও কেটে গেছে। হঠাৎ নন্দিনী কাঁদতে থাকে। প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তারপরে জোরে। ছোটোবুড়িকে জড়িয়ে ধ'রে তার সাদা শাড়িতে মুখ গুঁজে জোরে কাঁদতে থাকে। আমি কিছুই বুঝিনা। ছোটোবুড়ি বলতে থাকে - 'ছেড়ে দে মা লক্ষ্মী মা আমায় ছেড়ে দে। ওরা যে আমায় কেটে দেবে রে !' গোটা ছাদে ছোটোবুড়ি তখন সবেগে ছুটছে এ পাঁচিল থেকে ও মাথা। নন্দিনী তাকে সামলাতে না পেরে ছেড়ে দেয়। আমাকে এসে জড়িয়ে ধ'রে আর জামায় মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে। তখন নন্দিনী আমার চেয়ে কিছুটা লম্বা।

- কাঁদছিস কেন ?
- না না.....আমার তাকাতে ভয় করছে।
- কিসের ভয় ?
- ঘুড়িটা।
- কেন ?
- না না .....মুখ তুলবোনা

ও আমতা আমতা করে বলে যে ঘুড়িটার দিকে তাকালেই ওর ভয় করছে। যেকোনো মুহূর্তে নাকি ঘুড়িটা এসে ওকে তুলে নিয়ে চলে যাবে ওপরে। তারপর যেই কাটা যাবে ওকে ওপর থেকে ট্রামরাস্তার ওপর ফেলে দেবে। ফ্রি ফল। সম্ভবত সেই প্রথম কেউ আমায় তার উচ্চতাভীতির কথা বলে। আর আমি কিছুই বুঝতে পারিনা। বুঝতে পারিনি নন্দিনী ঠিক কেন ভয় পায়। কিসের ভয়! অত্যন্ত অন্টোলজিকাল জৈব এক আতঙ্ক ওর মধ্যে ছিলো। সেটা কেউ বুঝতে পারেনি। একমাত্র ঐ চাঁদিয়ালটা পেরেছিলো। আর টেনে বের ক'রে আনতে চাইছিলো সে আতঙ্ককে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটোবুড়ির নীল-সবুজ চাঁদিয়াল কেটে দিলো ওদের বাড়ির জাপানী পতাকাকে। আমি ছোটোবুড়ি দুজনেই 'ভো-কাট্টা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমাদের সরবতায় বাড়ির অন্য ছোটোরাও ছাদে চ'লে এলো। নন্দিনী তখনো ভয়ে আমাকে জড়িয়ে। কাটা চাঁদিয়ালটা রাশবিহারী এভিনিউয়ের ওপর একটা কদম গাছে প'ড়ে আটকালো। আর আমাদের নীল-সবুজ ঘুড়িটা ছোটোবুড়ি গুটিয়ে নিয়ে এলো। আমাদের বললো 'কাল তোরা একটা লাটাই কিনে আনিস'।

ঘুড়ি যখন ছাদের মাটিতে ঠেকে নন্দিনীর কান্না থামে। ছোটোবুড়ি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো - 'এই নে এটা তুই রাখ!' নন্দিনী ঘুড়িটা হাতে নিয়ে আমাকে ছেড়ে দেয় আর আমি ওর কাঁদের ওপর দিয়ে দেখি একতলার উঠোনে ওর দুই স্কার্টপরা বড়বোন ছাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে আর নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কথা বলছে। অন্যদের ঘুড়ি কেটে ফিরে আসা আমাদের এই ঘুড়িটার সেই প্রথম প্রাণহত্যা। নন্দিনীর আঙুলে সে লাট খাচ্ছে - এই দৃশ্যটা আমি আজো ভুলতে পারিনা। ঘুড়িটা নন্দিনীকে ছাড়েনি কোনোদিন। এরপর থেকে কতবার তাকে লাট খেতে দেখেছি নন্দিনীর আশেপাশে ঘরের দেয়ালে টিনের তোরঙ্গে স্বপ্নে এমনকি সেই দিনটা যখন এলো যেদিন এলো ....

নন্দিনীরা ছিলো কারা ? কেন অনাত্মীয় হয়েও আমাদের বাড়িতে থাকতো সেসব মুলতুবী রাখতে চাই আপাতত। বরং নন্দিনীর ঐ দুই দিদির কথা বলি। ওরা দুজনেই কোনোদিন পাঁচতলার ছাদে ওঠেনি। কোনো ছাদেই নয়। ওরা কেবল একতলার উঠোনে খেলতো। প্রচন্ড হাসিখুশী দুটো মেয়ে। যুবতী হওয়ার পরেও তাই। রোজ বিকেলে দুজনে খেলতো। কখনো ছেঁদা হয়ে যাওয়া ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট আর দুটো শুকনো খয়েরী পাতা নিয়েও কি আশ্চর্য সহাস্য আমুদে কি অভাবনীয় নিঃশব্দ খেলা ছিলো ওদের। নিঃশব্দ কেননা ওরা ছিলো যমজ আর জন্ম থেকেই মূক-ও-বধির। একেকদিন ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যেও ঘর থেকে উঠোনে ছিটকে বেরিয়ে এসে ওরা ভিজতো। ওদের জলকেলি খিলখিল করতো অথচ তার খবর কেউ রাখতোনা। তার শাব্দিক স্মৃতির কোনো প্রয়োজনা ছিলো না। বজ্র ও বারিশের জগৎ ছাপানো সশব্দতার মধ্যে কালো আলো চিরে ছুঁড়ে দেওয়া ওই রূপোলি বর্শার তীব্র দ্যুতিকেও ওদের খেলার নৈঃশব্দ্য ভিজিয়ে নিভিয়ে দিতো। নিস্তব্ধতার মধ্যে অতো শব্দ অতো হর্ষ থাকে সেটা আমি ক্রমে ক্রমে বড় হবার পথে ওদের দেখে বুঝেছিলাম। কি যেন নাম ছিলো ওদের - চম্পাবতী আর হেমবতী না রঞ্জাবতী নাকি ওই রকম কিছু। ওদের পরে লাহিড়িদের আর একটা মেয়ে ছিলো। তাকে খুব কম দেখেছি। সে ঘরে থাকতো আগাগোড়া। শুনেছিলাম সে মেয়েটা ছিলো জন্মান্ধ। তার পর নন্দিনী।

পাঁচতলার ছাদের যেদিক দিয়ে তাকালে দেখা যেত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরীটা সেইদিকেই ছিলো প্রিয়া সিনেমা। এটা বোধহয় ওই ঘুড়িকাটারও আগের ঘটনা। বছর দুই আগের। রাস্তায় বোমা ফাটার মতো তীব্র শব্দ শুনে বাড়ির অনেকে ছাদে উঠে গেছি। মনে আছে আমার সাথে খুড়তুতো দিদি জয়িতা আর ওর ভাই সমর। সমর প্রায় আমারই বয়সী বা একটু ছোট। দিদি নন্দিনীর চেয়ে কিছুটা বড়। প্রিয়াতে সম্ভবত ম্যাটিনি-শো চলছে তখন। আমরা দেখলাম - হলের সামনের বিজ্ঞাপন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। তার সামনে

বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ভিড়। পুলিশ এলো বলতে বলতে। টিয়ার গ্যাসের প্রথম শেলটা পড়লো ঠিক আমাদের বাড়ির নীচে চিত্তবাবুর মনিহারী দোকানের সামনে। ভয়ংকর শব্দে জয়িতাদি কাঁদতে শুরু ক'রে দেয়। সেই দেখাদেখি আমি আর সমর।

সেই সময় প্রিয়ায় ম্যাটিনি শোয়ে একটা রাজেন্দ্রকুমারের ছবি চলছিলো। রাজেন্দ্রকুমার এক চা-বাগানের মালিক। বাগানে বাঘ পড়ে। বারবার। প্রায় প্রতি দু-সপ্তাহে বাঘ কামিনদের ঘরে চড়াও হ'য়ে মানুষ মারে কখনো বাচ্চা তুলে নিয়ে যায়। রাজেন্দ্রকুমার একদিন তার রামধনু রঙের জিপ আর শাগরেদদের নিয়ে সেখানে গিয়ে বাঘ মারে। তার চামড়া ছাড়িয়ে ম্যানসনে মার্বেলের মেঝেতে ফেলে রাখে। মালিক তখন অবিলম্বে চা-বাগানের কুলি-কামিনদের নতুন হার্টথ্রব। তার নাম 'অর্জুন সিং' থেকে বদলে হয়ে যায় 'শার্দুল সিং'। আর রাজেন্দ্রনাথ তার মোটামতো বিদূষক। লোকটার নাম বর্তুল সিং। অদ্ভুত ছবি কিন্তু! কেননা ছবিটার যে নায়িকা সিমি তার সাথে কিন্তু রাজেন্দ্রকুমারের প্রেম হয়না। অ্যাকচুয়ালি তার সাথে কারোরই প্রেম হয়না। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র মতো এই ছবিতেও সিমি গায়ে কালো রঙ মেখে স্থানীয়া শ্রমিক। আর এই শ্রমিকদের নেতার নাম জঙ্গল সাঁওতাল। একদিন আধরাতের কুয়াশা ভেদ ক'রে জঙ্গলে সকলকে নিয়ে যায় সেই জঙ্গল সাঁওতাল ও তার সতীর্থরা। গ্রামের মানুষকে আসল বাঘের চেহারা ও চরিত্র দেখিয়ে দেয়। সেদিন রাতে কলকাতার একটি মোটা কালো চশমা পরা শুকনো চেহারার ছোকরা সে গ্রামে ছিলো। তার নাম ছিলো চারু সান্যাল। সেও আসল বাঘকে দেখে ফেলে।

চিত্র ২৩ ঃ ছাদের ঠিক যেখান থেকে প্রিয়া সিনেমার অগ্নিকান্ড আমরা দেখি।

তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আসলের চেয়েও আসল একটা বাঘকে দেখে যা অন্যরা দেখতে পায়নি। সেটা সে জঙ্গলকে বোঝায়। পারেনা প্রথমে। তারপর সে রাজেন্দ্রকুমারের থেকেই কলকাতা যাবার টিকিট ম্যানেজ ক'রে সেখানে গিয়ে এই বাঘের গল্প লিখে বই বের ক'রে ফেলে। মাসখানেকের মধ্যে। সেই বই প'ড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু ছোঁড়া যারা বীটলসের অন্ধভক্ত তারাও সেই চাবাগানে যায় ও চারু সান্যালের দেখা আসলের-আসল বাঘ দেখতে পায়। জঙ্গলের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হয় এবং অবিলম্বে কলকাতার সমস্ত কলেজে সেই বাঘের একটা লাল রঙের পেন্সিল-স্কেচ ছড়িয়ে পড়ে। দেয়ালে দেয়ালে। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা সেটা দেখতে পেতো না কিন্তু বিশ্বাস করতো বাঘ আছে। কিরকম বাঘ? আসলের-আসল। সাদাকাগজের ওপর লালরেখা দেখলেই বাঘের কথা মনে পড়তো। রাজেন্দ্রকুমারের এক শালা ছিলো। সে কিন্তু এই প্রেসির ছোকরাদের সাথে সঙ্গে ভিড়ে যায়। সে ছেলেটা বাংলা ভালো জানতো না কিন্তু হিন্দী ইংরেজী আর সাঁওতালি জানতো। সে-ই নিউ ইয়র্কের টাইম ম্যাগাজিনকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেয়। রাজেন্দ্রকুমারের শাগরেদরা সব জানতে পেরে একদিন শালাবাবুকে এসে প্রচন্ড কেলায়। শেষে মাটিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। মানে যাকে বলে নক-ডাউন। সেদিন থেকে এই দলের নাম হয় - নক-শাল। আর এদেরি একদল সেদিন প্রিয়া সিনেমার সামনে এসে প্ল্যাকার্ড দেখাতে থাকে। তারপর কেরোসীন-বোমা মারে কেউ। একটা প্ল্যাকার্ডে আগুন লাগে তার থেকে গোটা হোর্ডিঙে। পুলিশ এসে পড়ে। ক্রমাগত টিয়ার গ্যাস চার্জ করা হচ্ছে আর আমরা তিনজন পাঁচতলার ছাদে যেখানে সে গ্যাস পৌঁছয় না গাধার মতো কেঁদে চলেছি অবিরাম। এইসব ভাঙচুরের মধ্যে বড় হয়ে উঠছে নতুন সমাজের স্বপ্ন। আর এদিকে রাজেন্দ্রকুমারের কি হয়েছে.....একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেই ছায়াছবির সাথে। নক-শালদের সাথে। মানুষ দর্শকের সাথে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এইসব দূরত্ব ছিলো
অপরাজিতার থেকে কবরখানার ফলকের
বাঁচতে না পারার ব্যর্থতাই যে স্মৃতির মূল
এই ধারণার চারপাশে তারাফুল উঠেছিলো অতীতে
যার সঙ্গে পাতাল রেলের যে একটা সম্পর্ক আছে
লুকোনো সেতু আছে জমাদারের সিঁড়ি আছে অবিকৃত

ভাঙা বাড়ির বাইরে বাইরে

জালজট ছাড়ানোর অ্যালগরিদ্ম তার চেয়েও জটিল
খরগোশের লাফানো ছন্দ তার নেই
যে মাটির তলায় তাদের গুপ্তজীবনের সুড়ঙ্গজাল
ব্রড ব্যান্ড নেটওয়ার্ক
তার ওপরেই আমাদের নরম পদধ্বনি আলগা ভিত
নিসর্গ এসে শিল্পের কোন কাজ করেনা
কেবল রোজ আসে ধুতি পাঞ্জাবী গেলাসে ঢালে কবির রুধির
কাঁদুনে কবিতার স্যালাইন ওয়াটার দেখে যাত্রা করে -
পুষ্পা আই হেট টিয়ার্স

এইবার মনে পড়ে গেলো সেই ছবিতে সিমির নাম ছিলো - 'পুষ্পা'।

আগুন ছোঁয়াচে। কিন্তু তার স্মৃতি তার দৃশ্যস্পর্শ যে এমন সংক্রামক এমন সুদূরপ্রসারী - জ্যোতিষছকের ভেতরে ঢুকে প'ড়ে তার শিখা ছক পুড়িয়ে দেয়। সমস্ত আভ্যন্তরীন আগুন যেভাবে পোড়ায়। কোনো ধোঁয়া দেখা যায় না। শুধু এক ওলফ্যাক্টরি বোধ। শুধু ঘ্রাণ যতোটা বললো ততোটা। জয়িতাদি সেটা টের পেলো এই ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই। প্রিয়া সিনেমার সেই সাইপ্রেসশাখার মতো অগ্নি তাকে ছাড়তে পারলোনা। এই জয়িতাদিকে কিন্তু ছোটোবুড়ি বড় ভালোবাসতো। সে আমাদের সকলকেই বাসতো কিন্তু জয়িতাকে বোধহয় সবার চেয়ে বেশি। এই ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া গেলো একটা কালীপুজোর দিন। ততোদিনে নক-শালরা বিমূর্ত বাঘের ছবি ভুলে গেছে প্রায় সকলেই। আর যারা ভোলেনি পুলিশ তাদের জেলে পুরেছে। সপ্তাহে একদিন ক'রে বন্দীদের আলিপুর চিঁড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়ে বাঘের খাঁচায় ভ'রে দেওয়া হয় পাঁচ মিনিটের জন্য। সেই থার্ড-ডিগ্রী বাঘ তাদের 'আসল' আর 'আসলের-আসল' - দুটো বাঘকেই ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে। কালীপুজোর রাত। আমরা সকলে ছাদে বাজি পোড়াচ্ছি। বড়রাও ভিড় ক'রে আছে। এরই মধ্যে জয়িতাদি রঙ মশাল হাতে ক'রে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে একা একা নীচে নামছিলো। পায়ে তার মায়ের রবারসোলের চটি। সে চটি বড় হতো অনেকটা। টাল সামলাতে না পেরে রেলিঙ ধ'রে ফেলে বেসামাল হয়ে। ওর স্কার্টে রঙমশালের অপরূপ বেগনি আগুন ধ'রে যায়। ভয়ে জয়িতাদি কান্না ও চিৎকার দুটোই ভুলে যায়। বেগনি আগুন তখন স্কার্টটার প্রেমে পড়েছে। এই সময় চারতলার বেসিনে ছোটোবুড়ি পানের পিক ফেলতে এসে ওপরের দিকে তাকায়। জয়িতাদিকে দেখে। ছোট্ট শরীরের ছটফটে বুড়ি তো। চট ক'রে ছাদের অতিরিক্ত খাড়া সিঁড়ি ধ'রে উঠে আসে। এসে তার সাদা শাড়ি সমেত জড়িয়ে ধরে জয়িতাকে। দুজনেই টাল হারায় আর গড়িয়ে পড়তে থাকে সিঁড়ি দিয়ে।

চিত্র ২৪ ঃ সিঁড়ির ঠিক সেই জায়গাটা

যখন চার তলায় গিয়ে ওরা পড়েছে আলিঙ্গন ছেড়ে গেছে আগুন নিভে গেছে সম্পূর্ণ - জয়িতা টের পায় ছোটোবুড়ির ঘাড় শক্ত। আর আধপোড়া সাদা শাড়ি সাদা ফুলহাতা ব্লাউজের আনাচে কানাচে রক্তের দাগ। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট জানিয়েছিলো অবশ্য - ওগুলো সবই নাকি পানের পিক।

ছোটোবুড়ির মৃত্যুতে আমরা বাচ্চারা ছাড়া আর একজন কেঁদেছিলো। আমাদের ঘি-বাবু।

আমাদের ছিলো গুড়ওয়ালা আর ঘি-বাবু সেলাইমাসী ও রফিকুল দর্জি
ম্যাগাজিনদা আর ড্রাইভার সুখরঞ্জন নাপিত বিহারিলাল চৌবে

ব্যক্তিগত পরিষেবার মধুরতা ভ্যান গোখ্ নিজের রঙ নিজে বানাতেন
এই বাড়িতেই ব্যাঙ্ক ছিলো একদা সকলের একা আলাদা অ্যাকাউন্ট
খয়েরি খাতা গীতবিতান কারো কারো পাটধুতি রাঙালুর পিঠে রাঙালু
মাংস-ভাতের রন্ধনতাপের ধারে ধারে সব একান্নবর্তী একদা ব্যাঙ্ক
এই বাড়িতেই খোপ-খোপ ঘর নিজস্বতার পায়রা পোষা
রেডিওগ্রাম পুরনো ফিলিপ্স মন-চাহে গীত দুপুর যখন চাতক কাহিল
ততোদিনে ব্যাঙ্ক উঠে গেছে
পয়রা গুড় আলাদা আলাদা তিনটে তলায় বিক্রি হয়

আগুনের সাথে একটা জয়িতাদির একটা দ্বান্দ্বিক ও শঙ্কামূলক সম্পর্ক তো ছিলোই কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া ও প'ড়ে পাশে ছোটোবুড়ির মৃত্যু দেখার পর থেকে জয়িতাদির বারবার ভার্টিগো হ'তে শুরু ক'রে। তার হাত থেকে সে কিছুতেই মুক্তি পেলোনা। ডাক্তাররাও এর একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন মাথার চোট কানের অভ্যন্তরে চোট লেগেছিলো এর থেকে ওর ভেস্টিবুলার সিস্টেম বা কর্ণপ্রকোষ্ঠ ব্যবস্থার ক্ষতি হয়। ভারসাম্যবোধ খানিকটা নষ্ট হয়ে যায়। আর একজন বলেছিলো - ওর পড়ে যাওয়াটা কাকতালীয় আসলে ওর ল্যাব্রিনথাইটিস আছে কানের সুড়ঙ্গের মধ্যে জীবাণু সংক্রমণ। সেটা সম্পূর্ণ সারে না বারে বারে হয় তখনই মাথা ঘোরে। উচ্চতাভীতি। আর এর সাথে সাথে কিছুটা স্মৃতিভ্রংশও হয়েছে ব'লে মনে হয়। জয়িতাদি ছোটোবুড়িকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। সম্প্রতি একদিন কিছুতেই মনে করতে পারলো না। আমি আর ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়ার কথা মনে করাইনি।

তার কল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আকাশের দিকে বাড়াতে বাড়াতে স্থাপত্য যেখানে এসে খেই হারিয়ে ফেলে অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার ক'রে নেয় ছাদ সেই জায়গা। বিশেষত আমাদের বাড়ির ছাদ যা একটু একটু ক'রে বেড়েছিলো এবং সাড়ে পাঁচতলার অংশটা শুনেছি বে-আইনি। যদিও ছাদের ঘরে কেউ থাকে না। ঘরটা কেন করা হয়েছিলো এখন আর কেউই বলতে পারেনা। অবশ্য ঐ ঘরে মা আর জ্যেঠিমা প্ল্যাঞ্চেট করতেন। আমি কয়েকদিন থেকেছি। একটা কাঁচির ওপর কুলো ঝুলিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে কাঁচিটাকে সকলে মিলে ধ'রে আত্মাকে ডাকা হতো। আত্মা এলে তাকে মাল্টিপল-চয়েস প্রশ্ন দেওয়া হতো। ঠিক মাল্টিপল চয়েস না বাই-চয়েস। কুলো ঘুরলে - 'হ্যাঁ' না ঘুরলে 'না'। এই ঘরটার প্রতি রিয়ার দুর্বলতা ছিলো। ও প্রায় আসতো। একা একা। ছবি-আঁকার খাতা নিয়ে। ছাদে তখন মিস্ত্রিদের কাজ হচ্ছে। বালি ইঁট। দুটো কোম্পানীর ইঁট। একটা ইঁটের ওপর লেখা থাকতো - PREM। অন্য ইঁটের ওপর - RIVERS। নীচে রাশবিহারি এভিনিউয়ের দিকের ফুটপাথে একটা ফেরিওলা বসতো রাস্তায় প্লাস্টিক পেতে। শস্তার চিরুণি সোপকেস আয়না ফিতে চুলের কাঁটা সেফটিপিন - এইসব নিয়ে। রাশবিহারি এভিনিউয়ের আশেপাশে নিশ্চয় ওসব জিনিস কেনার লোকসমাজ ছিলো তখন। লোকটার নাম ছিলো লাহিড়ি। মানে পদবী। সঙ্গে বসতো তার সবচেয়ে ছোটো মেয়েটা। একদিন লাহিড়ি দুটো ভাঙা আয়না নিয়ে আমাদের বাড়ির মধ্যে এলো। চোখে জল। দোতলায় দাদুর ঘরে গিয়ে নালিশ করলো। আমাদের ছাদ থেকে কে যেন একটা ইঁট ফেলে দিয়েছে। গোটা থান ইঁট। পাঁচতলা থেকে। ভাগ্য ভালো রাস্তায় কেউ ছিলো না। ইঁট গিয়ে ওর প্লাস্টিকের ওপর বিছানো আয়নার ওপর পড়ে। অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে দামী দুটো আয়না। ওর সাত বছরের ছোটো মেয়েটা কাছেই ছিলো। কাঁচ ছিটকে তার কপালে লেগে বিশ্রীভাবে কেটেছে। মৃত্যুও হ'তে পারতো। ইঁট প'ড়ে ভেঙে দু-টুকরো হয়েছে। লাহিড়ি সেটাও এনেছে। দাদু ইঁট জোড়া দিয়ে দেখেছে - PR\EM।

আমার ডাক পড়ে সবার আগে। স্বপ্নিলতা ও কল্পপ্রবণতায় যে বাচ্চাদের মধ্যে সে বয়সে আমিই সবচেয়ে এগিয়ে ছিলাম - এতেই এর প্রমাণ হলো। কেননা ছাদে সবচেয়ে বেশি যে সময় কাটায় সে আমি। ঘরে ঢুকে দেখলাম মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কপালে রক্ত ও গভীর কাটা দাগ। সবাইকে জেরা ক'রে দাদু বের করে ফেললেন - এটা রিয়ার কাজ। রিয়া কেন এমন করলো সেটা সে বলতে পারলো না। বরং বললো একটু আগে একদল জোনাকি তাকে তাড়া ক'রে আর তার কিছুই মনে নেই। দাদুকে রিয়াকে বকলেন না। ওর ছাদে যাওয়া চিরতরে বন্ধ হলো। কিন্তু দাদু লাহিড়িদের প্রায় বিনামূল্যে দুটো ঘর দিলেন আমাদের বাড়িতে। একতলার দুটো ঘর। সঙ্গে বাথরুম ছিলো না। সেটা ওদের ক'রে নিতে হবে। অল্প ভাড়ায় বাইরের একটা দোকানও দিলেন। চায়ের দোকান। লাহিড়ি দোকানে একটা বোর্ডও বসায় এক সপ্তাহের মধ্যে। কিন্তু সেই বোর্ডে তার পরের দশ বছরেও কোনো নাম বসেনি। আমাদের বাড়ির লোকেরা কেউ কোনোদিন ঐ দোকানে খায়নি। বাড়ির দোকান হলেও ওটা যেহেতু 'ছোটোলোক'-এর দোকান আমাদের ঢুকতে মানা করা হতো। ওইভাবে আমাদের অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। ফলে বড় হয়েও দোকানটার প্রতি কোনোদিন ঔৎসুক্য আসেনি। লোকের মুখে মুখে দোকানটার নাম হয়ে গিয়েছিলো - 'ডেভিল্‌স শপ'। কে যেন চক দিয়ে দোকানের ফাঁকা নামবোর্ডে লিখে দেয় - DEVIL'S SHOP। কেন ঐরকম নাম - সেটাও ভেবে দেখিনি। অথচ দোকানটা ছিলো নন্দিনীর বাবার।

হ্যাঁ কাঁচের টুকরোয় কপাল-কাটা ফেরিওলার মেয়েটাই নন্দিনী। লাহিড়ি মারা যাবার পর নন্দিনীই দোকানটা চালাতো। একবার কলকাতা ফিরেছি। এক পুরনো স্কুলের বন্ধুর সাথে দেখা। সে এই দোকানে চা খেতে আসে। আমাকেও ধ'রে নিয়ে এলো। সেই প্রথম দোকানে ঢোকা। ঢুকে দেখি রেজিস্টারে নন্দিনী ব'সে। তখন ওর বয়স সবে তিরিশ পেরিয়েছে। সেই শেষ দেখা। সেদিনই শুনেছিলাম ওই দোকানের ডিমের ডেভিল খুব নাম করা। তার থেকেই - ডেভিল্‌স শপ। কিছুই বদলায়নি দোকানটার। টিমটিমে বাতি পুরনো দেয়াল। পুরনো কাঠের টেবিল-চেয়ার। খদ্দেরও সকলেই মোটামুটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত। ডিমের ডেভিল ভাঙতেই সেদিন খুব ধোঁয়া বেরোয়। আমার চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়। এইভাবে ড্যাম্প চোখ সেদিন আড়াল করতে পেরেছিলাম। অনেক পুরনো কথা সেদিন মনে পড়ে -

চিত্র ২৫ঃ ডেভিল্‌স শপ

এককালে আমাদের ছিলো বেবি অস্টিন
যা বাড়ির কোনো পুরুষের হাতে চলতো না
কেবল আমার তরুণী মা

বিকেলবেলার লেকে ঘোরা
একবার চালু হলে সে গাড়ি থামতে চায়না
পেছনের জানলার কাঁচ নামতোনা
পেছনের সীটে আমি
বেবি অস্টিন
ফলে ঐ টিনছাদের গ্যারাজ
পরে এলো অন্য গাড়ি ড্রাইভার সুখরঞ্জন

কিশোরীদের মাঝের মেয়েটা কমলিকা
দরজা খুলে পাশের সীটে দুপুর দুপুর
- আজ কোথায় যাবে ? আমরা বেশ বর বউ
আমরা বেশ সাহেব মেম

ব্রেক আমার পা ছোঁয় না

গিয়ার-খেলনা খেলতে খেলতে হাতল এখন খুব রিভার্স
গ্লোব ঘুরছে দুরন্তপনায়
অর্থতরুর সমস্ত পাতা
ঝড় তুলে নেয় ন্যাড়া ডালিম

- গাড়ি চালাবেনা আজ ? আজ আমরা বেড়াতে যাবো না ?

আমার ওপর টিপটিপ জল পড়ে আশপাশে ছলাৎ ছলক
- তবে আমিইকি এই জমা জল ?
ঝুঁকে পড়ে শুধায় কিশোরী

কিশোরী এখন কাঠচাঁপা
অসংখ্য ছবির ফ্রেম খুলে জুড়ে মাস্তুল
আবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসছে সাঁকোর সামনে
কাঠচাঁপার প্রত্যন্তে ছোটো কাঠের বাড়ি

দরজা খোলা
একবার মনে পড়া নাম ধ'রে ডাকলেই
সে ছুটে বেরিয়ে আসবে
আমার যে সব মনে প'ড়ে গেছে

যেন প্লাস্টিসিনের খেলনা। এই দেশ ব্যাপারটা। ভাঙছে। জোড়া লাগছে। আবার ভাঙছে। সব ২০-২৫ বছরের মধ্যেই। তখন যুদ্ধ বেঁধেছে। রোজ সন্ধ্যায় কলকাতায় কার্ফু হয়ে যায়। ছোটোমামা একদিন চোখে কালো চশমা প'রে বাড়িতে এলো। আমায় কোলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। দিয়ে আবার লুফে নেয়। দুজনেই হাসি। কিন্তু ছোটোমামা চশমা খোলে না। বললো - 'জয় বাংলা'। মানে কি ? মানে হলো বাংলাদেশ ভেঙে গেছিলো। এবার আবার জোড়া লাগবে। মানুষ স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু শত্রুরা তো তা চায় না। তাই তারা বাঙালীদের চোখের অসুখ দিয়েছে। সারাদিন চোখ কড়্কড় করে জল পড়ে আঠা বেরোয়। রাতে ঘুম হয়না। আর ভোরে চোখের পাতা লেগে যায়। কিন্তু স্বপ্ন বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। স্বপ্ন দেখতে বদ্ধপরিকর মানুষ এই বিচ্ছিরি অসুখটারও কি সুন্দর নাম দিয়েছে। স্বপ্নের মতো নাম - জয় বাংলা। একটা লোক আছে। তার নাম শেখ মুজিব। সে কি সব বলে আর লোকে শুনলেই কেঁদে ফেলে। এসব শুনে আমিও কাঁদলাম সেদিন। জয় বাংলা।

নৃতত্ত্বের সঙ্গে জেনেটিক্সের হঠাৎ বিভেদ লাগলো
তৃতীয় পরিচ্ছেদে গিয়ে আমার মনে পড়লো
সেবার গল্পটা আমরা ভাগ ভাগ ক'রে পড়েছিলাম
সবাই নিজের লাইনটা গাইলে তবেই যৌথকয়ার
কতগুলো বছর বাড়ির ভেতর মৃত্যুগুলো বাইরের গাছপড়া
সময়ঝুরির বিনুনিতে ফিতে তার রঙ বলো দেখি ?
নদী বয় অযত্নে যাকে নিয়ে বয় চেনেনা
সেইই পাথরের ওপর দাগ কাটে নদীকে লেখক ভাবে ভুল লোকে
কবে যেন চারতলা শেষ হয়েছিলো
কর্কটরেখায় দেগে দেওয়া বাল্য আমাদের
রেডিয়েশনে জ্ব'লে স্থূলকায়ার শাড়ি খ'সেছে
বৈতরণীর জল
কি শীতল ?

জ্বোরো রঙের স্থলপদ্ম কীর্তনিয়ার পায়ে লেগে কাতর গানের
আতরদান ওল্টায়
এছাড়াও ধাত্রী পান্নাদের জমা বুকের দুধে টিন টিন কান্না
কলঘরের লিক শেষে শ্যাওলা এসে বুঁজে দেয় কাটাঘুড়ির পচনশীলতা
ঝ্যাঁটাকাঠামো দিয়ে গেলো মহালয়ার সকালে পুজোসংখ্যা

আলাদা তলার মৃত্যু এখন আলাদা এক থেকে তাই
আরো আলাদা ফুটপাথের গাছপড়া

সেদিন অনেক রাত তখন। আমি একটা কালো রঙের টিনের খাটে একা শুতাম। কে ঘুম থেকে ধাক্কা দিয়ে চিমটি দিয়ে তুলে দিলো। আধো-অন্ধকারে দেখি নন্দিনী। চুপিচুপি ছাদে নিয়ে গেলো। কার্ফুর সময় আমাদের ছাদে উঠতে দেওয়া হতো না। ফলে কোনো যুদ্ধবিমান আমরা দেখতে পেতাম না। সেদিন একটু চাঁদ ছিলো। এক কামড় দেওয়া একটা রাতাপি। পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি দুজনে। ঘুম তখন চটে গেছে। নন্দিনী বার বার আকাশ দেখে। বলে আজ সন্ধ্যায় দেখলি - দু-দুটো হেলিকপ্টার গেছে। একটা ন্যাট।

- ন্যাট ? যাঃ !
- হ্যাঁরে ন্যাট ছিলো। বাপরে কি শব্দ ! ওর মধ্যে লোক থাকে জানিস ? কি বলে বলতো ?
- পাইলট
- হ্যাঁ কিন্তু আরো লোক থাকে।
- কে বলেছে ?
- দাদু।
- তাদেরো পাইলট বলে ?

- না। সাব.....সাব সাব-.....কি যেন দাদু বললো।

রাত নিশ্চয় দুটো। সামনের বাড়ির বারান্দায় তখনো একটা লোক। ইজিচেয়ারে বসে। হাতের আগুন জ্বলছে নিভছে। কর্নেল মজুমদার। চুরুট খাচ্ছে নিশ্চয়। চাঁদের আলোয় আমাদের দেখতে পেলো। একবার অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো। নন্দিনী চুপচাপ। যেন স্বপ্ন দেখছে। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আমার সেই অদ্ভুত অনুভূতি হলো। গা-হাত পা গরম হয়ে উঠলো জ্বরের মতো। ঘোর লাগলো মাথায়। ভীষণ ছুঁতে ইচ্ছে করলো নন্দিনীকে। হাতের চেটো দেখতে গিয়ে দেখি সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভয় লাগলো। নন্দিনীর হাত ধরি। ও সাড়া দিলো না। তখন ওর হাত টানলাম।

- আরে টানছিস কেন ?
- তোর ছ্যাঁকা লাগলো না ?
- কেন ?
- দ্যাখ

আমি ওর হাতটা ছেড়ে আমার হাতের চেটো খুলে ওকে দেখালাম। গাঢ় সাদা ধোঁয়া। উনুনের ধোঁয়ার মতো। নন্দিনী অবাক হলো। আমার হাত ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয়ংকর জ্বর এলো। গা পুড়ে যেতে থাকলো। কিন্তু নন্দিনী বললো - কই ছ্যাঁকা দিলো নাতো। গরম তো নয়।

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর আনন্দমেলায় জুনিয়র পি সি সরকারের ফর্মুলা পড়ে আমি একটা ম্যাজিক করি। সেটা বলছি। একটা চিনেমাটির বাটিতে অনেকগুলো দেশলাই বাক্স থেকে ব্লেড দিয়ে ঘষে ঘষে বারুদ জমা করতে হবে। তারপর বারুদটা পুড়িয়ে দিতে হবে। সব পুড়ে গেলে একটা হলুদ তেল পড়ে থাকে। সেইটা একটা খালি হোলিওপ্যাথির শিশিতে ঢেলে নিই। ওই তেলের এক ছিটে তালুতে লাগিয়ে ঘষলে হু হু ক'রে ধোঁয়া বেরোয় হাত থেকে। কিন্তু সেদিন রাতে সে ম্যাজিক আমি জানতাম না। আমার তখন সাত বছর বয়স। নন্দিনীর সাড়ে আট। এসব বলতে বলতে আরো একটা আজ মনে হলো। সেরাতে নন্দিনীর হাতে ছ্যাঁকা কেন লাগেনি আজ বুঝতে পারি। ওর দুই দিদি ছিলো মূক-ও-বধির। মেজদি জন্মান্ধ। আর নন্দিনী ! - হয়তো স্পর্শান্ধ।

সে রাতে কোনো ন্যাট এলো না। সেটা ছিলো সেপ্টেম্বর মাস। ১৯৭১। যে মাসে অ্যালেন গিন্সবার্গ এসেছিলেন কলকাতায় শেষবারের জন্য। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি আমি আর নন্দিনী। হঠাৎ ও বলে - 'কর্নেলদের পেছনের বাড়িটা দেখ। দেখতে পাচ্ছিস ?' ভগ্নাংশ চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম একটা ধুতি পরা লোক বাড়িটার গায়ের পাইপ বেয়ে উঠছে না নামার চেষ্টা করছে। এক হাতে কি যেন একটা। কাঁধে একটা ব্যাগ। কিছুই বুঝতে পারিনি। নন্দিনী হঠাৎ বললো - 'ও চোর। নিশ্চিত চোর।' ব'লে ভয় পেয়ে গেলো। আমরা দ্রুত নীচে নেমে যে যার ঘরে। পরদিন সব জানা গেলো। ভোর থেকেই পাড়ায় হই হই। পুলিশ এলো। দমকলও এলো। নীচে রাস্তায় নেমে সব দেখতে পেলাম। দমকলের লম্বা বুম বের ক'রে ওই বাড়ির তিনতলার চওড়া কার্নিসে লাগানো। একজন কর্মী বুম বেয়ে কার্নিসে গিয়ে কি যেন একটা তুলে দেখালো রাস্তার জমায়েতকে। আর সকলে হর্ষধ্বনি করলো। একটা স্যুটকেস। চোর পালাতে পারেনি। (আজ ভাবলে আমার বদ্ধমূল মনে হয় চোরের ভার্টিগো ছিলো। পাইপ বেয়ে নামার পথে ওজন সামলাতে না পেরে চোরাই মাল কার্নিসে ফেলে পালিয়েছিলো।) তবে অন্য ব্যাগটা নিয়ে গেছে। ওপরে তাকিয়ে কর্নেল মজুমদারের সাথে চোখাচুখি হলো। উনি তখনো ওনাদের চারতলার বারান্দায়। তখনো মুখে চুরুট।

সব জানাজানি হয়ে গেলো। আমাদের বাড়িতে পুলিশ এলো। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলো। কি দেখেছি কালরাতে ! কর্নেল মজুমদার সব বলেছেন - যে ওবাড়ির দুটো ছেলেমেয়ে তখন ছাদে ছিলো। বাড়ির সবাই জানতে চাইলো - কার সাথে ছাদে গিয়েছিলাম মাঝরাতে। বলতে হলো। সব ঠিক মনে নেই। কিন্তু কেউ খুশী হয়নি। 'ন্যাট' দেখতে গিয়েছিলাম শুনে একটু হাসাহাসিও হলো। আর জব্বলপুরের সেজ পিসী ভ্রূ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো - 'রাতভর কেয়া গোলি চলা/ পর্ ছত্ পে থি মধুবালা'। বাড়িশুদ্ধু লোক কর্নেল মজুমদারের ওপর ক্ষেপে গেলো। কর্নেলের তখন এমন কিছু বয়স না। কিন্তু তিনি যুদ্ধে যাননি। আমরা তাকে কোনোদিন যুদ্ধে যেতে দেখিনি। কোনো কাজেও না। সকাল-সন্ধে বারান্দায়। সম্ভবত পঞ্চাশ পেরোবার আগেই উনি আর্মি থেকে রিটায়ার করেন। ছোটোকাকা সেসময়ে ওকে দেখলেই রেগে যেত। সেদিন বললো 'ব্যাটা যুদ্ধে যাবার নাম নেই। রাতদুপুর বারান্দায় ব'সে ফুক্ফুক। তোর সামনে দিয়ে চুরি হচ্ছে আর দোষ দিচ্ছিস দুটো শিশুকে। এইরকমই হয় - যব দুনিয়া থে ফৌজ মে/ হাম থে মৌজমে'।

এইসব বোধহয় কর্নেলের কানে যায়। একদিন উনি আমাদের ডাকলেন। আমাকে আর নন্দিনীকে। আমাদের ওর বারান্দায় বসতে দিলেন। হেসে বললেন - 'তোমরা প্রথম এলে কিছু খেতে দিতে হবে তো ! দাঁড়াও তোমাদের জ্যেঠিমাকে বলি। ততোক্ষণ তোমরা বারান্দায় ব'সো।' তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন - 'one should always get a clear sky in a day like this। দেখেছো একটাও কাক নেই। সব ওই নীচের তারে ব'সে আছে।' দেখলাম সত্যি তাই। সমস্ত কাক নীচের রাস্তার তারে ব'সে। জিজ্ঞেস করলাম - কেন ? কর্নেল একটু হেসে চুরুট টেনে বললেন '...because I always love to keep the sky clear; and in order to do that I gave Vertigo to the Birds...'। এই ব'লে হো-হো ক'রে হাসলেন। ভেতরে গেলেন। আমরা চুপ ক'রে ব'সে আছি। আকাশ দেখছি। হঠাৎ শুনলাম এক অদ্ভুত সুরে কর্নেল মজুমদার তার বউয়ের সঙ্গে কিসব কথা বলছেন। অনেকটা এরকম। কর্নেল বলছেন

- তবু বলো। আমি জানতে চাই ....

- যা জানি তাকে সেই স্বপ্নের চৌহদ্দি সরু ক'রে রাখে। গলির মতো দালানের মতো সরু। আমি হাঁটছি সেই দালান ধ'রে হাঁটছি হাঁটছি। তারপর করিডোর শেষ হয়ে গেলো। তোমার মনে পড়ে ? স্টিভেনসনের 'কিডন্যাপ্‌ড' ? সেই যে ডেভিড ব্যালফোর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে উঠছে এমন সময় একটা ধাপে বিদ্যুৎ চমকায় আর সে দেখতে পায়.....

- পরের ধাপ নেই। পায়ের নীচে অতল শূন্যতা..... তাইতো ?

- ঠিক তাই। আমারো মনে হচ্ছিলো করিডোরের ঠিক এই জায়গায় পৌঁছে এরপর আর কিছু নেই - কেবল যে আঁধার শূন্যের শরীর। যে আঁধারে কিছুই আর মনে পড়ে না। পড়া সম্ভব নয়।.....আমি বুঝতে পারছিলাম যে এই আঁধারে প্রবেশের সাথে সাথে আমি মরে যাবো। করিডোরের শেষ আমি দেখে যাবো না।

- ওইসব ছোট ছোট দৃশ্যের পাতাবাহার ওই যে ক্ষণদ্যুতির অণুকণা ওইসব মনে আছে ?

- ঝাপসা কিন্তু। চুম্বনদৃশ্যের ওপর যেরকম জানলার কাঁচ আমরা চাই আশা করি। ভারি বৃষ্টির ওপর বারান্দার দরজার কাঁচ.....

- ঠিক আছে। ঠিক আছে। বুঝলাম। কিন্তু আর কি মনে পড়ে ?

- একটা ঘর। মনের মতো ঘর। মনেরও ঘর। সেখানেও জানলা আছে। আমি জানলার সামনে বসে থাকি। চেয়ারে। আর দেখি। জানলা দিয়ে গাড়ি দেখি। আর গাড়িগুলোও আমাকে দেখে। দেখে আমি একা। একা ঐ ঘরে।

- আর কি ?

- আর একটা কালো চৌকোণা ?

- চৌকোণা ?

- হ্যাঁ। মনে হবে মাটিতে পাতা কালো ক্যানভাস।

- জ্যাকসন পলাকের ?

- হ্যাঁ তবে কালো। খুব নিবিড় ক'রে তাকালে বুঝবে একটা কবর। খোঁড়া খালি নতুন কবর।

- কোথায় ?

- জানিনা জানিনা খোঁড়া কবর। নতুন বিবর। অপেক্ষারত। আমার জন্য।

- তুমি কি করে বুঝলে তোমার জন্য ?

- আমি জানি। জানি সব জানি

- এর কোনো মানে হয় না .....

- হয় হয়। আমি জানি। কবর ফলক ফেলা আছে পাশে।

- নাম লেখা ?

- না । নতুন পাথর। সাদা। মোছা সাদা। বিরচিত। অভাব। ভাব নয়। নাম নেই। কিন্তু লেখা হবে । আমি জানি আমার নাম। আমি জানি.....

- কি ক'রে জানো ?

- যেমন ক'রে তুমি বুঝতে পারো তোমার খিদে পেয়েছে। ঘুম আসছে। যেমন ক'রে বুঝতে পারো তুমি প্রেমে পড়েছো। পলাকের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না ? সাংবাদিক ওকে জিজ্ঞেস করেছিলো - আপনি যেভাবে আঁকেন তাতে কি ক'রে বোঝেন

কখন ছবি শেষ হচ্ছে ? পলাক কি বলেছিলো ? - আপনি কি করে বোঝেন কখন সঙ্গম শেষ হচ্ছে ? কখন ফুরিয়ে যাচ্ছে শরীরের ভালোবাসা

- বেশ। আর কি ?

- স্বপ্ন এক প্রাসাদ। ভাবো এটা তার ঘর একটা। ভাবো পাড়ার জলসা থেকে ছিটকে এসে এক কলি প্রজাপতি..... ওই রকম কিছু। একটা উঁচু খুব উঁচু মিনার। নীচে বাগান। ওপরে ঘন্টা দুলছে। বড় ঘন্টা । রূপোলি। স্পেনের কোথাও।

- স্পেনে ?

- হ্যাঁ স্পেনেই হয়তো। ছবিটা টানতে গেলেই হাওয়া হয়ে যায়।

- কোনো দেয়ালচিত্র দেখেছিলে ? কোনো পোর্ট্রেট ?

- না।

চিত্র ২৬ ঃ দেয়ালে গাঁথা তাক-আলমারি

- এসব কোনো প্রাসাদের কথা। যদি তার চাবিটা পেতাম। চাবির গোছাটা। একটার পর একটা দরজা খুলে.....

- অথবা জানলার পাশে দেয়াল-গাঁথা তাক। তাকভর্তি পুতুল খেলনা তার মধ্যে থেকে খুঁজে নিতে হবে ছেলেবেলার সেই মুখটা..... এই যে সমস্ত কথা বলছি তোমায় এর একটা ব্যাখ্যা আছে জানো ! একটা ব্যাখ্যা। ধরো আমার ভারসাম্য হারিয়ে গেছে তাহলে তো এর একটা ব্যাখ্যা হয় ? হয় না ? এই যে আমি যা সব বলছি। বা ধরো গোটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে আমি সেই ট্রেনটা খুঁজছি যেখানে আমার পুঁতিটা প'ড়ে গিয়েছিলো

- গোটা পৃথিবীতে কতগুলো ট্রেন আছে ? চালু আর অচল মিলিয়ে ?

- জানিনা জানিনা জানিনা। আমার মাথা ঘুরছে। আমি পড়ে যাবো। এত উঁচু কেল্লায় আমায় কেন নিয়ে এলে ?

পাশের ঘর থেকে আমি আর নন্দিনী কর্নেল ও তার বউয়ের এই সংলাপ শুনছিলাম। অবভিয়াসলি কিছুই বুঝছিলাম না। সবটাই ট্যান যাচ্ছিলো। কিশোর বয়সে দেখতাম কর্নেল আর তার বউ পাশের পাড়ায় পূর্ণ দাস রোডে একটা বাড়িতে যেতেন সন্ধ্যার দিকে। নাটকের রিহার্সাল দিতে। সেটা ছিলো সুব্রত সেনশর্মার বাড়ি। সুব্রত বাংলা ছবির নিয়মিত অভিনেতা ছিলেন। সত্যজিত রায়ের একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর ওঁর স্ত্রী অশোকা আন্টি ছিলেন আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাস-টিচার। সুব্রতর নাটকদলের সদস্য ছিলেন কর্নেলরা। কাজেই বড় হবার পথে সেদিনকার সেই সংলাপকে আমি কোনো নাটকের ধ'রে নিয়েছিলাম। অনেক বছর পর একদিন অ্যালফ্রেড হিচককের একটা ছবি দেখতে গিয়ে টের পাই এই সংলাপ ছবির একটা সীন থেকে নেওয়া। তবে কাব্যনাটকের মতো ক'রে নেওয়া। কোন ছবি বলছিনা।

নন্দিনী চুপ ক'রে ব'সেছিলো। কাঁধের ওপর সেই নীল-সবুজ চাঁদিয়ালটা ফেলা। হঠাৎ বললো - 'আজো কি কার্ফু হবে ?' কার্ফু হলোনা কিন্তু আচমকা আকাশ মেঘে কালো হলো। এতটাই যে নীচের তারে বসা পাড়ার সমস্ত কাক ছট্‌ফট করতে থাকলো। কিন্তু একটাও উড়তে পারছেনা ফলে আশ্রয় খুঁজতে পারছেনা। নন্দিনী চেয়ার থেকে উঠে রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে কাকগুলোর দিকে চেয়ে থাকে এক অদ্ভুত কাতরতায়। আমি বললাম -'কর্নেল মজুমদার বললো না কি একটা অসুখ দিয়েছে ওদের ওরা উড়তে পারছেনা।' নন্দিনী আমার দিকে তাকালো। মুখ কষ্টে কয়েক ইঞ্চি ছোটো হ'য়ে গেছে। আর ডান চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো সে সন্ধ্যার বৃষ্টির প্রথম ধারা। ক্যালেন্ডার বোঁ ক'রে ঘুরে গেলো। আর কালবৈশাখি এলো। 'বাড়ি চল' ব'লে আমি আর নন্দিনী কর্নেলের ফ্ল্যাট ছেড়ে ছুটতে ছুটতে নীচে এলাম। লেক ভিউ রোড পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকে ছুটতে ছুটতে সটান ছাদে।

চারতলায় কেউ ছিলো না। আমাদের ছাদে উঠতে বারণ করবার মতো কেউ। ছাদে উঠে আমি কোণের ঘরের কার্নিসের নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম আর নন্দিনী গোটা ছাদে ছুটে ছুটে ভিজতে লাগলো। বৃষ্টি মোটা হচ্ছে আর নন্দিনী ঝাপসা। হঠাৎ আমার মনে হলো গোটা শরীর জুড়ে একটা তীব্র যন্ত্রণা। শরীরের সর্বত্র। প্রচন্ড যন্ত্রণা। অবাক যন্ত্রণায় আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। একসময় কষ্ট বন্ধ হলো। মনে হলো অনেকটা লম্বা হয়ে গেছি। মুখে হাত দিয়ে দেখি গোঁফ গজিয়ে গেছে। কোঁকড়ানো দাড়ি। নন্দিনী নেই। কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে। এক প্রচন্ড দুরন্ত হাওয়া জেগেছে। কালবৈশাখীর অনল। লেকভিউ রোডের অনেক বাড়ির জানলা - একটার পর একটা খুলে যাচ্ছে বিকট শব্দ ক'রে। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। আর সেই আয়তক্ষেত্রের কালো ফাঁক দখল ক'রে বেরিয়ে আসে একটা মেয়ে। বয়স বছর ১৭/১৮। তার খোলা চুল উড়তে থাকে। সে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে। কিন্তু তার যে ভালোলাগছে তার ঠোঁট ব'লে দেয়। আমি নন্দিনীকে চিনতে পারি। অনেকগুলো নন্দিনী। এক একটা জানলায় একেকজন। আর সমস্ত কটা নন্দিনীর ডানহাতের কব্জিতে আগলের মতো সুতো বাঁধা। ঘুড়ির সুতো।

এই মেঘ ভাঙা তীরন্দাজি এই জলচ্ছত্র এই ভেজা পাখির অকূতোভয়
মায়ের শরীরের খবর দিয়ে যায়
কতরকমের অন্ধকারের কাছে আমার শিকড়ের দায় ছিলো
নাগরদোলায় বাঁধা ছিলো কতগুলো ঘোর মৌমাছি
একাধিক ওপড়ানির ঘনজৈবতা আমাকে এই মিশ্র পিলু দিয়েছে
এই মধ্যস্থতা

দুটো ভাষার জানলা আর বারান্দার ফাঁকে ব'সে দোলাচলমনস্কতা

ছিন্নমূলের বিচ্ছিন্নতাবোধে কোন ক্রোধ নেই নিষ্ঠুরতা নেই
এমনকি তৃষ্ণাটাও বানানো
ফুলদানির ভেতর মৃত ফুলের জল খাবার ভানে

কেন আমরা এমন দেখি বা দেখেছিলাম তার প্রত্যন্ত অর্থ আছে ব'লে আমার বিশ্বাস। য়ুঙের দিনলিপিতে পেয়েছিলাম একদিন উনি একটা মৃত মাছরাঙা দেখতে পান জলে ভেসে আছে। জুরিখের কাছাকাছি কোথাও। সুইৎসারল্যান্ডের ঐ অঞ্চলে মাছারাঙা সাধারণত দেখা যায় না। প্রশ্ন ওঠে ঐ মাছরাঙা বাস্তব না কার্ল য়্যুঙের কল্পনা। এই প্রবন্ধটা পড়ার সাতদিনের মধ্যে আমি পর পর দুরাত স্বপ্ন দেখি। প্রথমটায় দেখি পাঁশকুড়ার একটা গ্রামের চেনা এক পুকুরে অনেক মৃত মাছ ভেসে উঠেছে আর একটা মাছরাঙা এসে একটা একটা ক'রে মাছ তুলে নিয়ে যাচ্ছে শ্যাওড়া গাছে। মাছটা খেয়ে আবার উড়ে এসে তুলে নিয়ে যায় পরের মাছ। পরের রাতে স্বপ্ন দেখি ঐ একই পুকুরে ভেসে আছে মৃত মাছরাঙা আর একদল রঙিন পিরানহা জল থেকে উপরিতলে উঠে এসে তাকে নিয়ে ফিস্ট করে। বৃত্ত সম্পূর্ণ করার বহুচর্চিত তত্ত্ব এমনভাবে আমাদের মগজের পরিবেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে আমাদের স্বপ্নগুলোও কন্ডিশন্ড হ'য়ে যায় এইভাবে। আমাদের কবিতার রূপক যেভাবে। বা কবিতায় যে রূপক থাকতেই হবে - এই সমস্ত খুঁটে খাওয়া ধারণা।

ভঙ্গুরতার সবটাই সময়ের নারকেল ছোবড়ায় ঠাসা এমন নয়
শব্দ হলে বোঝা যায় ধামসার ভেতর ফাঁপা
সমস্ত স্মৃতিভ্রংশেই ক্ষয়-স্বাক্ষর নেই

হয়তো স্মৃতি গড়েই ওঠেনি কোথাও কোথাও
এমনও ঘরবারান্দা আছে যেখানে কেউ থাকেইনি বছরভর
বাক্য অসম্পূর্ণ কেননা যথেষ্ট ব্যাকরণ ছিলো না
কিছু কিছু এমন ভাবনা আছে
যা রূপকারের কব্জাগত নয়
লম্বালম্বি বাড়ানো বে-আইনি তলা নড়বড়ে ব্যালকনি
যেন মিথ্যে পার্সপেক্টিভ গড়ে তুলতে জোড়া
তার বাইরে রং পড়েনা কোনদিন
অসুখ প্রোজেরিয়া - চিরজরা
বড়জোর বছর ১৩র জীবনালেখ্য
তার মধ্যেই তাদের ইঁট খুলে যায় লোহা লেগে যায় লোহায়
ভুলে যাবার আগের দিন আমরা ভুলে যাই
তারা কোনদিন গড়েই ওঠেনি
অথচ গায়-গায়ের গাছ এককান্ডের ভেতরেই এলোমেলো
কত পরিচ্ছেদে ছড়িয়ে দিয়েছে চিরহরিৎ ঘনকাব্যলিপি
আর আড়াআড়ি বিদ্যুতের তার
আচমকা ভাবনাকে ওপর দিকে তাকাতে দেয়
পাতার প্রথম থেকে পুনরায় পড়ায় উপরোধ
আবার ফিরে আসছে

এসব ধূসরিমা থেকে কিন্তু আমি নন্দিনীকে দূরে রেখেছিলাম। সেই চাঁদিয়ালটা কিন্তু সত্যিই ও কোনোদিন ছাড়তে পারেনি। যতদিন লাহিড়িরা বেঁচে ছিলো ওদের ঘরে ঘুড়িটা দেয়ালে ঝুলতো। ঝুল প'ড়ে গিয়েছিলো তবু ঝুলতো। লোকে বলতো ঘুড়িটা মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়। দেয়াল থেকে খুলে হাওয়ায় লটকে বেরিয়ে যায়। যখন নন্দিনী বাড়ি ফেরে ঘুড়িটাও। নন্দিনী যখন যুবতী তখনো সে ঘুড়িটাকে ছাড়তো না।

ষোলো বছর পেরিয়ে আমরা দুজনেই অসম্ভব লাজুক হয়ে পড়ি নিজেদের নিয়ে। কথা সামান্য সৌজন্যহাসির পেছনে লুকিয়ে পড়ে। সিঁড়িতে আসাযাওয়ার পথে কেবল ঝিলিক দেখা। আর যখনই দেখা হয় কোথা থেকে আশা ভোঁসলের একটা না একটা বাংলা গান ভেসে আসতো। শুধু আশার গান। লাজুকতা দ্বিগুণ তখন। কেউ হয়তো আমাদের লক্ষ্য করতো। সেই-ই গানগুলো বাজাতো। এর মধ্যে একদিন ঘুড়িটা রাত্রে ফেরেনি। নন্দিনীর সাথে বেরোয়। নন্দিনী ফিরেছিলো। কিন্তু ঘুড়ি বেপাত্তা। সেই রাতেই নন্দিনীর আগের বোন - যে অন্ধ - সে মারা যায়। সেদিন কারো কান্নার আওয়াজ ওঠেনি বাড়িতে। ঘুড়িটা ফেরে তিনদিন পর এক ঝড়ের রাতে। নমাস পর আবার একদিন অন্য এক ঝড়ে উড়ে যায়। নন্দিনীর মা দু হাতে শক্ত ক'রে ধ'রেছিলো সুতো। তবু আটকাতে পারেনি। প্রায় একমাস ঘুড়ি ফেরেনি। আর ওই একমাসেই লাহিড়িরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মারা যায়। বোবা-কালা দিদিদের নন্দিনী দেখতো। সাদার্ন এভিনিউতে একটা মাদার ডেয়ারির ডিপোতে কাজ নিয়েছিলো। উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো করেছিলো। ঠিক এই সময়েই তার দুই দিদি কোথায় যেন চ'লে যায়।

স্কুলের পর নন্দিনী যোগমায়া দেবী কলেজে ভর্তি হয়েছিলো কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ওর বিয়ে হয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ছেলে। বরকে আমি কোনোদিন দেখিনি। কি করতো মনে পড়েনা কিন্তু তার পরের বছর সে ট্রেনে কাটা পড়ে। ছেলেকে একাই বড় করে নন্দিনী। তখনো আমাদের বাড়িতেই থাকতো। তবে নানা চাপে ওকে ঘর বদলে এ-উয়িঙের একতলার যে ছোট ঘরে ওর দুই দিদি থাকতো সেখানে চ'লে যেতে হয়। ওর যখন ৩৭ ওর ছেলের বয়স ১৮। সেই সময় ছেলে প্রথমে আলাদা হ'য়ে যায়। ক্রমে একদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। মার কাছে শুনেছি নন্দিনী কারো সঙ্গে দেখা করতো না। বিশেষ কথা হতো না। তবে সে যেখানে যেত সেই চাঁদিয়ালটা তার হাতে বাঁধা থাকতো। লাহিড়ির চায়ের দোকানটা চালাতো।

আমাদের বাড়ির এই উইঙে সে কোনোদিন আসতো না। শেষে একদিন আসে। আমি তখন লস এঞ্জেলিসে থাকি। তখনো নন্দিনীর চল্লিশ হয়নি। কেউ দেখেনি কখন। সম্ভবত গভীর রাতে সে এসেছিলো। সোজা পাঁচতলার ছাদে উঠে যায়। পরদিন খুব ভোরে একতলার ফুলের দোকান খুলতে আসা ছেলেটা ওকে ফুটপাথে পায়। রক্তাক্ত। শুধু মাথা নয় হাত-পা ভেঙেছিলো এমনকি মেরুদন্ড।

শুনেছিলাম নন্দিনীর হাতে ময়লা পুরোনো সুতো জড়ানো ছিলো। ঘুড়ির সুতো। আর তার অন্যপ্রান্ত খালি।

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কৌরব ১১২, অগাস্ট ২০১১